প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

জেলখানা আর জেলখানার অন্যেরা

কয়েক বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলখানার ভেতরের জীবনসংক্রান্ত সব কিছুই ছিল নাগরিক সমাজের চৌহদ্দির বাইরে। 'অপরাধ', 'সংশোধন' অথবা প্রশাসনিক দুর্নীতি ইত্যাদি কয়েকটা শব্দের মধ্যেই জেলসংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা ঘোরাফেরা করত। জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় অবশ্য মাঝে মাঝে দুর্দশাগ্রস্ত জেলবন্দীদের ছবি ছাপা হত। জেলের ভেতরকার পাগলাগারদের পাগলদের চরম দুরবস্থার রিপোর্ট পড়ে নাগরিকেরা বিচলিত হতেন, এই পর্যন্ত। সমাজবিজ্ঞানী বা অপরাধবিজ্ঞানীদের কয়েকজন অবশ্য ভারতের জেলব্যবস্থার সমাজতত্ত্বে উৎসাহ দেখিয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতার মধ্যে ঘোরাফেরা করা এই সমস্ত গবেষণা কিন্তু জেলপ্রশাসন, এর উপযোগিতা এবং তার ত্রুটিবিচ্যুতির আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। এমনটাই এতদিন চলে আসছিল। কিন্তু সত্তরের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনকে দমন করার রাষ্ট্রীয় প্রয়াস জেল সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতার অবসান ঘটাল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অন্যতম ক্ষেত্র জেলখানার অভ্যন্তরে অন্য অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ পেল। পরবর্তীকালে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মীরা অনেকেই তাঁদের জেলজীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন, বিবৃত করলেন রাষ্ট্রীয় নির্মম নিপীড়নের পাশাপাশি তাঁদের সক্রিয় প্রতিরোধ, বিদ্রোহের কথা। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বন্দীমুক্তি আন্দোলনও শুরু হয়। নাগরিক সমাজের একাংশ এই আন্দোলনে সামিলও হয়। আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয়, এই দাবি মেনে নিতে। সরকার বাহবা পায়, নাগরিকরাও নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু এরও বাইরে থাকে এক বৃহত্তর জগত, যে জগতের মানুষের বাস আমাদের পরিচিত চৌহদ্দির বাইরে, 'অন্ধকারে'। যারা এই সমাজের মধ্যেই কোনোরকমে টিঁকে থাকতে চেয়ে বা থাকতে না পেরে কোনো অপরাধ করে, যারা বার বার জেলে ফিরে আসে, কে লেখে তাদের কথা? জয়া মিত্রের 'হন্যমান' তাদের নিয়েই। সত্তরের বিপ্লবী রাজনীতির শরিক হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন তিনি। তাঁর জেল-জীবনের স্মৃতিচারণে এসেছে সাধারণ অপরাধীদের কথা, 'সামাজিক সুস্বাস্থ্য' বজায় রাখতে রাষ্ট্র যাদের জেলবন্দী করে তাদের নিজের মুখে বলা কাহিনীতে ফুটে ওঠে অন্য আরেক জগতের ছবি। এদের অধিকাংশই আসে সমাজের নিচু স্তর থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বাইরে তাদের স্থান, অ্যাকাডেমিক জগতের চট-জলদি ব্যাখ্যার সঙ্গে সে জগত

মেলে না। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, বিশ্বাস, প্রতিরোধের নিয়মও অন্য রকম। 'হন্যমান' সেই অচেনা জগতের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করায়, চমকিত করে। নাগরিক মহলে প্রচলিত রাজনৈতিক বন্দী—আর সাধারণ অপরাধীদের মধ্যে বিভাজন রেখা টানার দৃঢ়প্রত্যয়ী অভ্যেসে লাগে ভাঁটার টান। আর এইখানেই জয়া মিত্রের 'হন্যমান' সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত অন্যান্য জেল বৃত্তান্ত থেকে আলাদা হয়ে যায়।

আসলে 'হন্যমান' বইটি নিয়ে যেকোনো আলোচনাকেই অন্তত দুটি দায়িত্ব নিতে হয়। প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে বইয়ে বর্ণিত টুকরো টুকরো ঘটনা, মন্তব্য ইত্যাদি সহযোগে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অন্যতম ক্ষেত্র জেলখানাকে বোঝা। তার মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতার নানা দিকের কথা আসবে, আসবে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নযন্ত্রের পাশাপাশি তার সহায়ক অন্যান্য ক্ষমতার বাস্তব চেহারার কথা। আর দ্বিতীয় স্তরে নিয়ে আসতে হবে মহিলা সহবন্দীদের কথা যা লেখিকা নিবিড় মমতার সঙ্গে বলেছেন। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথাও এই প্রসঙ্গে আসে, আসে অবিরত অচেনামুখ যাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়িয়ে ধরাবাঁধা রাজনৈতিক তত্ত্ব খেই হারিয়ে ফেলে। এ যেন এক অনাবিষ্কৃত জগত, যার নিয়মকানুন হিসেব সবই আলাদা।

জেলখানা এবং রাষ্ট্র

লেখিকা সত্তরের বিপ্লবী রাজনীতির শরিক। দীর্ঘদিন জেলজীবন কাটিয়েছেন। অথচ সারা 'হন্যমান' জুড়ে তিনি নিজেকে আড়ালে রাখছেন, আর সামনে নিয়ে আসছেন তাঁর অন্য সহবন্দিনীদের যারা দৈনন্দিন জীবনে কোনোরকমে বেঁচেবর্তে থাকার তাগিদে বা নিতান্ত সহায়সম্বলহীন জীবনে একান্ত নিজস্ব কিছুকে বুকে আঁকড়ে ধরার অদম্য ইচ্ছের চাপে কোন অপরাধ করে। রাষ্ট্রের চোখে তারা অপরাধী, তাই সামাজিক স্বাস্থ্যের পোকা বাছাই করে সংশোধনের জন্য তাদের জেলে বন্দী করা হয়। 'প্রমাণিত অপরাধীদের পাশাপাশি থাকে অন্যান্য বন্দীরা, থাকে পাগল, ভবঘুরে আর স্বামী-পরিবার-সমাজ-পরিত্যক্তা মেয়েরা।' 'কীভাবে থাকে সেই মানুষেরা'? লেখিকা তার বর্ণনা দিচ্ছেন। আর এই বর্ণনায় ফুটে উঠেছে ভারতীয় জেলব্যবস্থার এক অন্যরকম ছবি যার সঙ্গে জেল সম্পর্কে ভদ্রসমাজের যে ধারণা তার কোন মিলই নেই।

সরকারি প্রতিবেদনে, সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণাপত্রে বা নাগরিক মননে জেলখানা বলতেই সংশোধনাগার বোঝায়। সামাজিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে জেলখানা অপরিহার্য। রাষ্ট্র আর সমাজের চোখে অপরাধ একধরনের অস্বাভাবিক রোগ। সুস্থ সমাজের ওপর এক ধরনের উৎপাত। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে, এই রোগের কারণ খুঁজে বার করা আর তার প্রতিষেধকের বন্দোবস্ত করা। তাই অপরাধীকে বন্দী করে আলাদা রাখা হয়, নানা 'মানবিক' বন্দোবস্তের আওতায় রেখে তার পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়। সাধারণ

অপরাধী ছাড়াও জেলখানায় থাকে নানা ঝরতি-পড়তি মানুষজন, ভবঘুরে ভিখারি, অনাথ, বেশ্যা আর পাগল। ধর্ষিতা, স্বামীপরিত্যক্তা মেয়েদেরও স্থান এখানে, সরকারি ভাষায় 'সেফ কাস্টডি'। উজ্জ্বল, সুস্থ এবং ভদ্রসমাজের কাছে যা কিছু উৎপাতসূচক তাকেই রাষ্ট্র, পুলিশ জেল-জরিমানার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে, শাস্তি দেয়। পুলিশ আর জেলখানার উপযোগিতায় বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার যাবতীয় বন্দোবস্ত, যার মধ্যে জেল হচ্ছে অন্যতম, সেই জেলখানা হয়ে ওঠে অস্বাভাবিকতা শোধরাবার জায়গা। তাই সেখানে থাকে হাসপাতাল, রুটিনমাফিক জীবন, থাকে ভোকেশনাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা যাতে বন্দীরা শ্রমের মর্যাদা কী তা বুঝতে শেখে। বন্দী-দের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে থাকে ঢালাও খাবারদাবারের বন্দোবস্ত। এইভাবে বন্দীরা শারীরিকভাবে তো বটেই মানসিকভাবেও উন্নতি লাভ করে। থাকে 'গুড কনডাক্ট' রেমিশনের ব্যবস্থা। এতকিছু ভাল ভাল বন্দোবস্তের মাধ্যমে অপরাধীদের বাইরের ভদ্র-সমাজের মনোমত গড়ে-পিটে নেওয়া হয়। সরকারি তথ্যদপ্তর প্রকাশিত বার্ষিক খতিয়ানে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ কত ভালভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ করে তার হিসেব বেরোয়। ভদ্রসমাজ অব্যাহত রাখতে সরকারি দায়বদ্ধতার কথা সোৎসাহে বলা হয়।

এতসব মানবিক বন্দোবস্ত অথচ 'হন্যমানের' পাঠক অস্বস্তিতে পড়ে। দেখে যে এই সমস্ত কিছুই বিকৃত হয়ে অস্বাভাবিক আর এক পাল্টা বন্দোবস্তে পরিণত হচ্ছে। লেখিকা দৈনন্দিন জেল জীবনে নিঃসীম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অহরহ দাপটের চেহারা তুলে ধরেন। অন্তহীন এই সন্ত্রাসের প্রকাশ ঘটে বন্দী মেয়েদের ওপর দৈহিক নির্যাতন আর অত্যাচারের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য বন্দীদের অসহায়ত্ব ও ক্লীবত্ব বজায় রাখা আর রাষ্ট্রীয় আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করা। প্রয়োজনে তাদের শেকলে বেঁধে রাখা হয়, অবাধ্য হলে মেরামত করা হয়, মেয়েদের ওপর নামিয়ে আনা হয় নানা পুরুষালি অত্যাচার। 'হন্যমানের' ছত্রে ছত্রে এই সন্ত্রাসের বিবরণ সচকিত করবে। কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধি বা সংবিধানের কোথাও বন্দীদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের কথা বলা নেই। সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক অধিকারের কথা সোচ্চারে বলা হয়েছে, বলা হয়েছে হেবিয়াস কর্পাসের কথা, যার বলে বন্দী তার নিজের শরীরের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি অপরাধ নিবৃত্তির জন্য বা অপরাধীকে দমন করতে, তার শরীরের ওপর আঘাত হানা বা ক্ষত সৃষ্টি করার কোনো অধিকার জেল কর্তৃপক্ষকে দেয়নি। বরং অন্যতম মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতীয় রাষ্ট্রের কাজই হচ্ছে জেলবন্দীদের সুস্থ নাগরিক সমাজে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। বন্দীদের প্রতি সংযমী ব্যবহারই হচ্ছে আধুনিক নিয়ম। ভদ্রলোকেরা অবশ্য 'হন্যমানে' বর্ণিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে বলবেন সাময়িক বিচ্যুতি, অথবা বড় জোর বেআইনি। ভারতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক গণতান্ত্রিক অধিকার ভঙ্গের উপর এক বিখ্যাত বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে পরিচিত সমালোচকও একই পথে হাঁটেন, বলেন এত কিছু সুস্থ ভাল বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় রাষ্ট্রের ওপর যেন ক্ষণে ক্ষণে এক ধরনের

বায়ুগ্রস্ততা ভর করে। এরই বশবর্তী হয়ে সে মাঝে মাঝে জনগণের উপর নামিয়ে আনে নিঃসীম দমনপীড়ন। আর এর শিকার হয় অসহায় কিছু লোক আর বন্দীরা।[১] প্রশাসন সংক্রান্ত আধুনিক মানবিক বন্দোবস্ত গড়ে তোলার কথা সোচ্চারে বলা হলেও তা আসলে স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের আইনি ধারা চালু হবার পাশাপাশি জনগণের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখতে রাষ্ট্র দমনপীড়নের ব্যাপক বন্দোবস্ত করে। অধীনস্ত জনগণের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণকে নিশ্ছিদ্র করতে গড়ে তোলা হয় নিপীড়ন যন্ত্রের নানা ধরন। উদ্দেশ্য জনগণের বশ্যতা আদায় করা। আধুনিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার পাশাপাশি সাবেক শাসনপদ্ধতিও কমবেশি টিকে থাকে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাষ্ট্রের ক্ষমতার সারমর্ম আইন-আদালত বা কাগুজে প্রশাসনের চত্বরে ধরা পড়ে না। নিম্নবর্গের জনগণের জীবন প্রক্রিয়ার ওপর শাসকগোষ্ঠীর দাপটের চেহারা অন্যরকম। জীবনের সব ক্ষেত্রে তারা সরকার আর সহযোগী শক্তিগুলির ভীতিপ্রদ শরীরী অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়। কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রকে তারা ভয় পায় তাই ভক্তিও করে। 'আই. জি., প্রিজনস্ জেল পরিদর্শনে এলে বন্দী মেয়েদের দেওয়ালের ধার ঘেঁসে লম্বা লাইন, নাক পর্যন্ত ঘোমটা টানা, জড়োসড়ো ভঙ্গি, হাতে টিকিট। আমলার নিছক উপস্থিতিই তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে' (পৃ. ৪৩)। রাষ্ট্রকে তারা ভয় পায় তাই ভক্তিও করে। আর ভক্তির বিনিময়েই তারা বদান্যতা আর কৃপা আশা করবে। তাই চালু 'মার্কা' ব্যবস্থা, বন্দীর 'গুড কনডাক্ট'-এর ভিত্তিতে জেল কর্তৃপক্ষ তার সাজার মেয়াদ কমায়। তাই 'মার্কা— যার উল্লেখ মাত্রই উদ্ধততম বন্দীও ফণা নামিয়ে নেয়' (পৃ. ১৫)। সংবিধান বা সরকারি আইনকানুনের মধ্যে জেলের যে নিরবয়ব সংশোধনকারীর উদারনৈতিক ছবি ফুটে ওঠে তার বিপরীতে জেল কর্তাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ চেহারা বন্দীরা হাড়ে হাড়ে টের পায়। অথচ তত্ত্বগতভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নতুন উদারনৈতিক বিধিবন্দোবস্ত এখানে গ্রহণ করা হয়েছে, অপরাধীদের দৈহিক নিপীড়নের মাধ্যমে শাস্তি দেবার পুরনো প্রথা বর্জন করে এসেছে তাদের মানসিক সংশোধনের ব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য অপরাধীদের পুনর্বাসন। আসছে শাস্তিদানের 'মানবিক পদ্ধতি'। আপাতত দৃষ্টিতে ভারতীয় রাষ্ট্র এক মানবিক চরিত্র গ্রহণ করলেও তার ক্রিয়াকলাপ চিরাচরিত ভারতীয় ধারণার মধ্যেই বাঁধা পড়ে। 'চব্বিশে ফেব্রুয়ারী জেল কর্তৃপক্ষ বিনা কারণে বিনা প্ররোচনায় সাতজনকে হত্যা করে।··· বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয় তাদের' (পৃ. ৫৩)। আসলে যে কোনো অপরাধই হচ্ছে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অবমাননা। তাই অবমাননাকারী অপরাধীর শরীরকে চরম নিপীড়নের মাধ্যমে ধ্বংস করে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অনিবার্যতা জাহির করা হয়। মনুসংহিতায় রাষ্ট্রের এই ধারণার কথা বারবার বলা হয়েছে। এই ধরনের কর্তৃত্বই হচ্ছে রাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজকর্তৃত্বের ভিত্তিই হচ্ছে রাজদণ্ড যার মাধ্যমে সার্বভৌম শক্তির প্রকাশ ঘটে। মনু এই রাজদণ্ডকে অভিহিত করছেন পুরুষ হিসেবে। এর বর্ণ হচ্ছে কৃষ্ণ এবং এর চক্ষু রক্তবর্ণের। ভয়ভীতি ও দুঃখ উদ্রেককারী এই দণ্ড সদাজাগ্রত থাকে বলেই

অধস্তন সকলে নিজ নিজ ধর্ম এবং কর্তব্যে অবিচল থাকে।[২] রাষ্ট্র কর্তৃত্বের এই কঠোর ধারণাই সর্বত্র বিরাজ করে, জেলখানাতেও। লেখিকা জেলবৃত্তান্তের মধ্যে নিয়ে আসেন তিমিরের কথা সেই তিমিরবরণ যে তালগাছের মত এ হেন রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মুখোমুখি দাঁড়াবার অদম্য সাহস দেখায় আর দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাষ্ট্র রাষ্ট্রকর্তৃত্ব অবমাননাকারী তিমিরের শরীর ধ্বংস করে (পৃ. ৩৬)।

জেলকর্তৃত্বের পাশাপাশি তার সহায়ক আর এক স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের অস্তিত্বের প্রসঙ্গ লেখিকা নিয়ে আসছেন। এসেছে শিখা, লালমোতি, সরযূ, পুষ্প নেইয়া আর তাদের তাঁবেদারদের কথা। তারাও অপরাধী, কিন্তু তাদের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীদের তফাত আছে। কর্তৃপক্ষের নীরব অনুমতিক্রমে বা যোগসাজশে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নযন্ত্রের পাশাপাশি তারা সমান্তরাল আরেক ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে তোলে। সাধারণ অপরাধীদের ওপর তারা নামিয়ে আনে দৈনন্দিন হিংসা, 'জেলের চাকা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নাটবল্টু এরাই' (পৃ.৭৬)। এই ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত, বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ তাকে মদত দেয়। 'প্রেসিডেন্সীতে বন্দীদের অবস্থা যাই হোক, কোন জিনিসের কার্পণ্য নেই' (পৃ. ৭৬)। কিন্তু অধিকাংশই শিখা আর লালমোতিদের 'ঘাঘরার নীচে সেলাই হয়ে, কোমরের কাপড়ে আড়াল হয়ে বাইরে চলে যায়…আর টাকা হয়ে ফিরে আসে' (পৃ. ৭৬)। সহৃদয় সরকারের নির্বিকার দয়াদাক্ষিণ্যের এমত পরিণতির পেছনে প্রশাসনের নীচুতলায় দুর্নীতির প্রসঙ্গ অনেকেই নিয়ে আসবেন। লেখিকারও এই ধারণা ছিল, 'আমাদের অনেকদিন পর্যন্ত এই ভুল ধারণাটা ছিল যে খাবার চুরি, বাসন চুরি ইত্যাদির ব্যাপার সম্পর্কে জেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভাল করে জানেন না' (পৃ. ১০৪)। কিন্তু 'ওপরে ঘাঘরা চাদর চাপা দেওয়া থাকলেও ব্যাপারটা আসলে খোলাখুলি' (পৃ. ৭৬)। আসলে সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না থেকেও এই নতুন ক্ষমতাগোষ্ঠী একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এদের অধিকাংশই সাধারণ অপরাধী, 'জেলে বসে উপার্জিত টাকা থেকে তারা কোর্টের কলকব্জায় তেল দেয়, যাতে তাদের কেস কোর্টে না ওঠে' (পৃ. ৭৬)। জেলের মধ্যে এরাই কর্তৃপক্ষের হয়ে অন্যান্য অপরাধীদের ওপর নজর রাখে, দমনপীড়ন চালায়, জেলের চাকা চালু রাখে। যে কোন রাষ্ট্রশক্তির কাছে এই ধরনের গোষ্ঠীর উপযোগিতা অপরিসীম। এটাই জেলের ভেতরে বা বাইরে সাধারণের ওপর নজর রাখে, খবরাখবর রাষ্ট্রকে যোগায় গণবিক্ষোভ দমনে রাষ্ট্রকে সহায়তা করে। জেলখানা আর শাস্তির বিবর্তনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে নামজাদা ঐতিহাসিক এদের চিহ্নিত করেছেন রাষ্ট্রের পুলিশ-বাহিনীরই এক উপগোষ্ঠী হিসেবে। এরা সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ না হয়েও বেহিসেবি জনগণের গতিবিধির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখে। 'হনুমানে' বিবৃত এই দুই স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের বিচিত্র মেলবন্ধন নতুন ভাবনার সঞ্চার করে।

প্রতিরোধ

জেলের অভ্যন্তরে জেলবন্দীরা যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় তার প্রতিবেদন অবশ্য বেসরকারি রিপোর্টে মেলে। খবরের কাগজে বেরনো জেলবন্দীদের দুর্দশার ছবি দেখে জেল অভ্যন্তরের নিদারুণ পরিস্থিতির আঁচ পাওয়া গেলেও দুর্দশাগ্রস্ত বন্দীদের প্রতিরোধের কোনো হদিশ কিন্তু মেলে না। এই সমস্ত রিপোর্ট থেকে মনে হতে পারে যে তারা যেন সরকারি দাক্ষিণ্য নির্ভর একদল অসহায় আর নির্বাক প্রাণী। কিন্তু, 'হন্যমানে' জেলবন্দীদের নিজস্ব কায়দায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনবদ্য বিবরণ আছে। বস্তুত, প্রতিবাদ আর অবাধ্যতা হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ, বাঁচার চেষ্টা হচ্ছে মানুষের ধর্ম। নিশ্ছিদ্র সন্ত্রাসের মধ্যেও জেলে কর্তৃত্বের মোকাবিলা করার সাহস তারা দেখায়। দৈনন্দিন এই প্রতিরোধ কখনো একক কখনো যৌথ। নিয়মকানুন ভঙ্গ করা, কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করা, অত্যাচারের আশংকা থাকা সত্ত্বেও গুণতিতে বাধা দেওয়া দৈনন্দিন প্রতিরোধের অঙ্গ। সর্বোপরি থাকে জেলখানা থেকে পালাবার চেষ্টা। উপজাতি গোষ্ঠীর মেয়ে বুধা প্রথম থেকেই কর্তৃপক্ষের চরম অবাধ্য, 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, নাম লেখানো, ওয়ার্ডের ভেতরে যাওয়া—প্রতিটি কাজে বাধা দিল আসুরিক ক্ষমতা নিয়ে' (পৃ. ৩৪)। অত্যাচার আর অনাহারে ক্লান্ত হয়েও সে পালাবার পথ খোঁজে। পলায়নে ব্যর্থ বুধা তেতলা সমান উঁচু ডাল থেকে ঝাঁপ দেয় নীচে চাতালের ওপর (পৃ. ৩৬) আর এই দৈনন্দিন প্রতিরোধের মধ্যেই বন্দী মেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে পারস্পরিক অদ্ভুত মমত্ববোধ, একে অন্যাকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরার অনবদ্য স্পৃহা।

পাগলাগারদ

রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন জনজীবনকে নিস্তরঙ্গ করতে যত পাগলছন্ন আর ভবঘুরেদের পাগলাগারদে পাঠায়। এই ব্যাপারে এদেশে ব্রিটিশ শাসকরাই পথিকৃৎ। নিজ দেশের আইন-কানুনের বয়ান অনুযায়ীই তারা যে এদেশে অপরাধ আর তৎসম্পর্কিত যাবতীয় 'অস্বাভাবিকতার' নানা মাত্রা ঠিক করে দেবে তাতে আর আশ্চর্য কী। আসলে ইউরোপে সতেরো শতাব্দী থেকেই পাগলদের বন্দী করে রাখা শুরু হয়, সাধারণ অপরাধী থেকে শুরু করে পাগল, ভবঘুরে, ভিখিরি, অর্থাৎ যাবতীয় উৎপাতকে জেলখানায় জমা করা হত। কারণ সদ্য গড়ে ওঠা নতুন আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা তার উদ্দেশ্য আর অর্থনৈতিক মূল্যবোধের কাছে এরা ছিল বিপজ্জনক। এই মানসিকতা থেকেই এদেশে আঠারো শতকের শেষের দিকে বিভিন্ন জায়গায় পাগলাগারদ গড়ে ওঠে, 'স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার' থেকে বিচ্যুত পাগলছন্নদের জন্যে আধুনিক নিরাময়

ব্যবস্থাও করা হয়। অবশ্য প্রশাসন এদিকে যে খুব একটা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তাও নয়, তবে এদেশে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো ইউরোপীয় পাগল আর ভবঘুরেদের নিয়ে তাদের চিন্তার অন্ত ছিল না। কারণ, একেই এদেশে তারা শাসক, রাজার জাত, তার ওপর ইউরোপীয় সভ্যতা আর উন্নত মানের সংস্কৃতিরও তারা বাহক, আর তাদেরই জাতের লোকজন যদি এদেশের পথে ঘাটে খেপামি করে বেড়ায় তাহলে এদেশের জনগণের চোখে তারা হেয় প্রতিপন্ন হবে। ব্রিটিশ সভ্যতা, ভদ্রতা নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলতে পারে। তাই প্রশাসন এই মর্মে নানা ব্যবস্থা নেয়।[৪] আর সাধারণভাবে এদেশীয় পাগলদের জন্যে পরবর্তীকালে কয়েকটা পাগলাগারদ গড়ে উঠলেও তা খুব একটা ইউরোপীয় কায়দায় সমস্ত পাগল আর ভবঘুরেদের ধরপাকড় করতে উৎসাহী হয়নি। এখনও নয়। তার কারণ মনে হয়, যে এদেশে পরিবার আর সমাজজীবনে চিরকালই পাগলদের প্রতি একধরনের সহানুভূতি আর ভালবাসার মনোভাব কাজ করেছে। তারা যেন উদাসীন কিছু পথিক, তাদের গতিবিধি অবাধ। যাবতীয় জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দের ঊর্ধ্বে তাদের স্থান, তারা একান্ত স্নেহের পাত্র। কেউ ভালবাসার কারণে পাগল, কেউ বা ঈশ্বর পাগল আবার কেউবা জ্ঞান পাগল অথবা অনেকে দুঃখ শোকে পাগল। প্রতি রাস্তা ঘাটে, গ্রামে গঞ্জে আর তীর্থস্থানে তাদের চলাফেরা আর বসবাস। প্রাক-আধুনিক ইউরোপীয় সমাজজীবনের পাগলদের প্রতি সহনীয় মনোভাবের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য মিলবে। তবে সেখানে আধুনিক নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠার সময় থেকেই এই মনোভাবে আসে পরিবর্তন, পাগলদের বন্দী করে রাখা শুরু হয়। কারণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার নতুন ধারণা ইতিমধ্যে অবাধে ঘুরে বেড়ানো পাগলদের উন্মত্ততাকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[৫] সতেরো শতক থেকেই ইউরোপে সমস্ত পাগলদের জড়ো করে পাগলাগারদে পাঠানো শুরু হয়। আধুনিক সংযত আর ভদ্র সমাজের সামনে অবাধে চলে ফিরে বেড়ানো পাগল যেন এক কলঙ্ক, তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝেঁটিয়ে পাগলাগারদে বেঁধে রাখা যায় ততই মঙ্গল। এরা যুক্তি, স্বাভাবিকতা হারিয়ে জন্তু-জানোয়ারের পর্যায়ে চলে গেছে তাই ইউরোপের বিভিন্ন পাগলাগারদে এদের খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়। তাদের হাতে আর পায়ে বেড়ি, তাদের দেখতে নাগরিকরা ভীড়ও জমায়। হাউস অব কমন্সে ১৮১৫ সালে উত্থাপিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে বেথলেহেম হাসপাতালে প্রত্যেক রবিবার এক পেনি খরচা করলেই পাগলদের কাণ্ডকারখানা দেখা যেত। আর এখানে সারা বছর উৎসাহী নাগরিকদের ভিড় লেগেই থাকত। ফ্রান্সের এক পাগলাগারদের রক্ষীরা আবার শুধু চাবুক মারার ভয় দেখিয়েই বন্দী পাগলদের নাচাত। এ কাজে কয়েক জন রক্ষী আবার বিশেষ নামও কেনে। জন্তু-জানোয়ারের শামিল এই সমস্ত পাগলদের ঠাণ্ডা করার একমাত্র পন্থা ছিল তাদের শারীরিক নির্যাতন করা। নতুন সভ্যতা আর সংস্কৃতির কাছে বিপজ্জনক এই ধরনের যাবতীয় উৎপাত বন্ধ করার

দায়িত্ব বর্তায় পুলিশ বিভাগের ওপর। সমাজে আসে নিস্তব্ধতা, আসে শান্তি। আর তারপরের ইতিহাস তো ক্রমাগত প্রগতির ইতিহাস। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই পাগলদের ওপর থেকে শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা কমতে থাকে, নানা সংস্কার আর মানবিক বন্দোবস্তের আওতায় পাগলদের রাখা শুরু হয়। পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বন্দী পাগলরা এবার ডাক্তার আর মনস্তাত্ত্বিকদের দায়িত্বে আসে। শুরু হয় তাদের বিকৃত মস্তিস্ক সংশোধনের কাজ, যাতে তারা আবার সুস্থতায় ফিরতে পারে। উন্মাদদের প্রতি সামাজিক আচার-আচরণের ক্রমবিবরণ লিখতে গিয়ে—মিশেল ফুকো এই 'মানবিক পর্যায়ে'র পেছনের যে প্রশাসক গোষ্ঠীর গভীর অভিসন্ধি কাজ করে তার অনবদ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য এর পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে বর্তমানের ইউরোপ। কিন্তু 'হন্যমানে' পাগলাগারদের যে ছবি আমরা পাই তাতে কিন্তু ইউরোপীয় পথে পা বাড়ানো ভারতীয় প্রশাসনের ওই 'মানবিক পর্যায়ে' উন্নীত হবার কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে না। এখানে পাগলদের নিয়ম মাফিক হয়ত বন্দীও করা হয়, কিন্তু বড় বড় খাঁচার মধ্যে বন্ধ পাগলদের কেউ কেউ শেকলে বাঁধা, কেউ বা ছাড়া। 'বাইরে থেকে ভাত-তরকারী...ছুঁড়ে দেওয়া হয় মাটিতে।' কাড়াকাড়ি করে খায় তারা। যাদের কাড়াকাড়ি করে খাবার শক্তি নেই তারা না খেয়ে থাকে, দিনের পর দিন। মারাও যায় প্রতিবছর (পৃ. ১৩৭)। অথচ সরকারি হিসেব-নিকেশে পাগলাগারদ মানবতা আর আধুনিক সংশোধনাগারের চেহারা নেবে। আপাত অর্থে ভারতীয় রাষ্ট্র সংশোধনাগার হিসেবে পাগলাগারদকে গড়ে তোলার আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহ্য গ্রহণ করলেও কার্যত তা পাগলদের ওপর দমনপীড়ন নামিয়ে আনায় পর্যবসিত হয়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাষ্ট্র আর জেলের অভ্যন্তরে তার সহায়ক শক্তিগুলির চোখে সাধারণ অপরাধী আর পাগল সমার্থক। তাই জন্তু-জানোয়ারের মতো তাদের খাঁচায় রাখা হয়। লেখিকার সহবন্দিনী এক নাম না জানা বয়স্ক পাগল মাসের পর মাস বেড়িতে বাঁধা থাকে, তার পায়ের চামড়া ফেটে-ফেটে ঘা হয়ে যায়। প্রেসিডেন্সি জেলের পাগলবাড়িতে হা-হা করা শীতে ঠাণ্ডা লেগে আর না খেতে পেয়ে তারা মরে। সরকারি রিপোর্টে লেখা হয় 'Natural death' (পৃ. ১৩৬-১৩৭)। জেল প্রশাসনের নিঃসীম হিংস্রতার হাত থেকে এক পাগল আসন্ন প্রসবারও রেহাই নেই। ওয়ার্ডারের সঙ্গে অবাধ্য আচরণের দায়ে মেট্রন তার পায়ে বেড়ি বাঁধার হুকুম দেন। 'মাটিতে ফেলে বেড়ি লাগানো পা-টা মাটি থেকে ফুট খানেক উঁচুতে গরাদের গায়ে বাঁধা আছে। বাইরে আসতে পারছে না ওর শিশু। রাত্রির নিস্তব্ধতাই শুধু ভাঙে মায়ের মৃত্যু আর্তনাদে' (পৃ. ১২৯)। দৈনন্দিন দুঃখ, শোক আর আঘাতের অসহনীয় চাপে খেই হারিয়ে উন্মাদগ্রস্ত হলেও জেলগারদে তার রেহাই নেই, জেল প্রশাসন আর তার সহায়কদের কাছে পাগলামিও এক ধরনের অপরাধ। তাই তাদের ওপরেও চলে দৈহিক নিপীড়ন।

জেনানা জগত

জয়া মিত্র তাঁর লেখায় বিভিন্ন সহবন্দিনীদের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই সহবন্দিনীদের অধিকাংশই হচ্ছে নিম্নবর্গের। লেখিকার বর্ণনা থেকে তাদের পারিবারিক আর সামাজিক জীবনের এক অন্তরঙ্গ ছবি ফুটে ওঠে। উঠে আসে একের পর এক অজানা কিছু মেয়ের মুখ, আর তাদের ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর। বিভিন্ন কণ্ঠস্বর থেকে এক বিশেষ সামাজিক সম্পর্কেরও আভাস মিলবে। এসেছে গঙ্গার কথা, যার স্বামী তার সমক্ষেই অন্য নারীতে আসক্ত। অথচ সেই স্বামীই সমাজের মুখ পুড়িয়ে গঙ্গার জেলে আসার কারণে তাকে পরিত্যাগ করার ভয় দেখায়। গঙ্গা আছড়ে পড়ে কাঁদে, সে জানে এ সমাজে স্বামী পরিত্যক্ত হবার মানে কী (পৃ. ১১)। আসে জোগাড়ে মেয়ে ইতোয়ারীর কথা। ইতোয়ারী এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল। কিন্তু জাতে না মেলায় তার বাবা-কাকা জোর করে বিয়ে দেয় অন্য আরেক জনের সাথে। চারটে ছাগী আর চল্লিশ টাকায় কেনা স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এসে যে ইতোয়ারীর হাতে মাথা ফাটায় (পৃ. ২১)। দুবার তালাক পাওয়া জায়দার প্রথম পক্ষের মেয়ের দিকে তৃতীয় বারের বিয়ে করা মানুষটি হাত বাড়ালে জায়দা তাকে দা দিয়ে কাটে, অতঃপর জেল (পৃ. ২৩)। কমলা মাসী পনেরো বছরে বিয়ে হয়ে সতেরোয় বিধবা। দুজনের খাবার জোগাড় করতে না পেরে তার মা বাধ্য হয় বড় কর্তার বাড়িতে মেয়েকে পাঠাতে। সেই বাড়িতে মেজ কর্তার পাল্লায় তার গর্ভসঞ্চার হলে, মেজ কর্তাই তাকে গঞ্জে গিয়ে ঘরভাড়া নিতে হুমকি দেয়। লোকলজ্জার ভয়ে জাত সন্তানকে মুখে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে কমলা। খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয় সে, আর মেজ কর্তা পৌরুষের অহংকার নিয়ে তাতে সাক্ষী দেন (পৃ. ৪৭-৪৮)। এরকম আরও অনেক মেয়ে বন্দীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ রয়েছে 'হন্যমানের' পাতায় পাতায়।

এরা সবাই প্রমাণিত অপরাধী, অন্তত রাষ্ট্রের আইনের চোখে। ইতোয়ারী, জায়দা, কমলাকে খুনী প্রমাণ করার মতো সাক্ষীসাবুদ আর আইনের সশব্দ উপস্থিতি এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে নির্দিষ্ট ছকে ফেলে তাকে তার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে দেয়। অবিলম্বে তারা জুডিসিয়াল রেকর্ডভুক্ত কিছু নীরস তথ্যে পরিণত হয়। বিমূর্ত আইনের দলিল দস্তাবেজ আর তার প্রতিষ্ঠানের নিচে চাপা পড়ে অস্ফুট কিছু নারীর কণ্ঠস্বর। এই সমস্ত কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে নিম্নবর্গের মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন। তাদের ওপর পুরুষতান্ত্রিক দাপটে আর তার বিরুদ্ধে মেয়েদের নিজস্ব কায়দায় প্রতিরোধেরও অনবদ্য ছবি পাচ্ছি 'হন্যমানে'। বাবাকাকার জোর করে চাপিয়ে দেওয়া স্বামী চারটে ছাগী আর চল্লিশ টাকার বিনিময়ে অনিচ্ছুক ইতোয়ারীর শরীরের ওপর স্বামীত্ব ফলাতে এলে ইতোয়ারী তার মাথা ফাটায়। জায়দা তার সহায়সম্বলহীন জীবনে একান্ত আপনার মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীকে মেরে ফেলে। ছেলের বৌয়ের ঘরে জোর

করে ঢোকা মহাজনকে ছেলে খুন করলে বরদা বুড়ী ছেলেকে বাঁচাতে খুনের দায় নিজের ওপর চাপায়! অথচ …'বরদা বুড়ীর বলিচিহ্নিত গ্রাম্যমুখের সঙ্গে ম্যাডোনার কোনো মিল দেখতে পান না বিচারক…' (পৃ. ২৯)।

লেখিকার সহবন্দিনীদের অধিকাংশই হচ্ছে একেবারে নিচুতলার মেয়ে, চলতি কথায় 'গতর খাটিয়ে'। তাদের জীবনযাপনের নিস্তরঙ্গ কিছু ঘটনা এখানে লিপিবন্ধ। প্রচলিত রাজনৈতিক তত্ত্ব আর তার ছকে বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি ঝরতি-পড়তি মেয়েদের জীবনে অবিরাম ঘটে চলা এই সমস্ত ঘটনার সামনে দিশেহারা বোধ করে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ঘটনা আর মালিক / শ্রমিক-কৃষক সর্বস্ব সাদাকালো অর্থনীতি তত্ত্বের চটজলদি ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত বিদগ্ধ মার্ক্সবাদী অর্থনীতিবিদ রূপকাঁওয়ার হত্যার মতো বিখ্যাত ঘটনা ঘটলে এর পেছনে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার দাপট খুঁজে বের করেন, গ্রামীণ মাতব্বরদের দুরভিসন্ধিও তিনি ফাঁস করে দেন।[৬] মেজকর্তা আর কমলার ঘটনা হয়ত এখানে এইভাবে মিলে যাবে। কিন্তু গঙ্গা, ইতোয়ারী, জায়দাকে আমরা কীভাবে দেখব যেখানে তাদের বাপ, কাকা আর স্বামীরাই তাদের ওপর পুরুষালি দাপট চালায়। দাপটের মুখোমুখি ইতোয়ারী, জায়দা রুখে দাঁড়ায়, গঙ্গা স্বামী পরিত্যক্ত হবার ভয়ে কান্নাকাটি করে, কমলামাসী অপবাদের ভয়ে অবৈধ সন্তানকে মুখে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। আশেপাশের নিম্নবর্গের মেয়েদের বহমান জীবনযাপন আর সামাজিক অস্তিত্বের নানাবিধ সমস্যার সামনে অর্থনীতি সর্বস্ব বামপন্থা এক উটকো তত্ত্বে পরিণত হয়। তারা কৃষক-সংগঠন, ছাত্র-সংগঠন ইত্যাদির মতো মহিলা-সংগঠন গড়ে নিয়ম রক্ষাও করে। কিন্তু বামপন্থী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চাপে মেয়েরা হারায় তাদের নিজস্ব জগৎ। নারী চেতনা বৃদ্ধির প্রমাণ হিসেবে পার্টি রিপোর্টে মহিলা কর্মীদের বিশ্বশান্তি রক্ষা, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়।[৭]

আসলে কমলামাসী, গঙ্গা, ইতোয়ারী, জায়দা ইত্যাদিরা পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার। এই সমাজে মেয়েরা জন্ম থেকেই পুরুষের মুখাপেক্ষী, তাদের বাধ্য। মেয়েদের জীবনচর্চা, তাদের আচারবিধি এই সবেতেই এই পুরুষালি নিয়ন্ত্রণ স্পষ্ট। ভারতীয় সমাজে নানা প্রথা, পাপপুণ্য ইত্যাদি ধারণার মধ্য দিয়ে মেয়েদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। নানা শাস্ত্র আর অনুশাসন দিয়ে মেয়েদের নানা বিধি নিষেধের নিগড়ে বাঁধা হয়েছে। এখানে মেয়েদের সব কিছুকে নিঃশব্দে মেনে নেওয়াটাই দস্তুর। কুমারীর কুমারীত্ব, বিধবার পবিত্রতা আর স্ত্রীর স্বামীর প্রতি আনুগত্যই নিয়ম, যার এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ। যে ভাবেই হোক মেয়েদের শরীরকে শুদ্ধ পবিত্র রাখতেই হবে। এই পবিত্র নারীর ওপর কুল আর পরিবারের মর্যাদা নির্ভর করে। এই ব্যাপারে তাদের ওপর পুরুষের সজাগ দৃষ্টি যে থাকে তা বলাই বাহুল্য। মেয়েরা তাদের নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করলেই সমাজে আসবে বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্য।

মনুসংহিতায় এই বিশৃঙ্খলার কথা বলা হয়েছে, যেখানে স্ত্রীর ওপর পতির প্রভুত্ব থাকবে না আর মেয়েরা স্বাধীন হয়ে যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হবে।[৮] তাই পুরুষশাসিত সমাজ নিজেদের মনোমত জায়গায় মেয়েদের বেঁধে রাখতে বন্দোবস্ত করে নানা আয়োজন যাতে মেয়েরা নিঃসাড়ে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, যাকে বহিষ্কার অথবা প্রায়শ্চিত্তর ব্যবস্থা। কমলামাসীর অবৈধ সন্তান হলে 'সুচতুর' মেজকর্তা তাকে গঞ্জে গিয়ে ঘর বাঁধার কথা বলেন। লোকলজ্জার ভয়ে কমলা তার বাচ্চাকে গলা টিপে মেরে ফেলে, সমাজের ভয় তাকে অধোমুখ করে রাখে, শাস্তি মাথা পেতে নেয়। সামাজিক অনুশাসন নারীর 'বিচ্যুতির' ওপর যতটা কঠোর পুরুষের ওপর ততটা নয়। তাই মেজকর্তা পার পেয়ে যায়। পুরুষালি জুলুমের শিকার অন্য মেয়েদের অবস্থাও তথৈবচ। 'নূরজাহান, নমিতা, অনিতা, বীণা, সরলা, প্রীতি, নীরমায়া, টুসি··· প্রত্যেকেই ধর্ষিতা। সমাজে ধর্ষিতার স্থান নেই, লোকলজ্জার ভয়ে তাদের বাড়ির লোকও তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। তাই জেল হচ্ছে তাদের কাছে 'সেফ কাস্টডি' (পৃ. ১১৯—১২১)। এই ভাবে জেল হয়ে যাচ্ছে আর এক অন্য সমাজ যেখানে যাবতীয় বিচ্যুতরা জমছে। অথচ এই বিচ্যুতির সহায়ক পুরুষ নিজেরাই। এখানে জড়ো হচ্ছে যত ধর্ষিতা, স্বামী-প্রেমিক পরিত্যক্তা আর অনাথ মেয়েরা। এখানেও শেষ নয়। জেল প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশে 'কাঁচা মাংসের ব্যবসার বিরাট' মালিকনরা (পৃ. ১১৯) এদের বার করে নিয়ে যায়, ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে।' বন্দীত্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে এই সমস্ত মেয়েরা বাধ্য হয় এই জীবন বেছে নিতে। 'সংশোধনাগার' 'সেফ কাস্টডি' ইত্যাদি শব্দ খচিত জেলখানা আসলে অপরাধ আর অপরাধী আরও বেশি তৈরি করে, আভ্যন্তরীণ আর বাইরের ক্ষমতাশালীরা এর থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়।

ভারতীয় সমাজে জীবনের সব ক্ষেত্রে মেয়েদের এই পুরুষনির্ভর অনাড়ম্বর অস্তিত্বই যেন স্বাভাবিক। সাত চড়ে রা না কাড়া লক্ষ্মীমন্ত মেয়েদের ধারণাই এখানে বার বার শোনানো হয়। সারা জীবন ধরেই তারা পুরুষের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য দেখাবে, পুরুষের দুঃখেই একমাত্র সে দুঃখী, পুরুষের আনন্দেই সে আনন্দিত। পুরুষ নারীর কাছ থেকে একতরফা খালি গ্রহণই করে যাবে, এমনকি তার শরীরও। সেখানে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো স্থান নেই, কারণ তার শরীরের কোন স্বাতন্ত্র এমনকি কামও থাকতে নেই। নারীর প্রতি এই বিধান আর তাদের নির্দিষ্ট আচারবিধির এই ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরে শাস্ত্র, ব্রতকথা আর ধর্মের মধ্যে দিয়ে বহন করা হয়েছে। নানা আখ্যান, যেমন কৃষ্ণলীলায় গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তির কথা উল্লেখ করা যায়। এই আখ্যানে গোপীরা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়, যাদের নিজস্ব কোনো কামাবেগ নেই। শুধুমাত্র কৃষ্ণই এখানে সব, তিনি তাদের প্রলুব্ধ করেন, তাদের নিয়ে যথেচ্ছাচার করেন, আবার তাদের ছেড়ে ইচ্ছে মতো চলেও যান। এখানে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের নিছক খেলার বস্তু, কৃষ্ণের আনন্দে তাদেরই আনন্দ। মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে এমত ধারণা সমাজের সব স্তরে বিরাজ করে। নিম্নবর্গের পুরুষদের মধ্যেও। প্রতিবাদী লৌকিক গৌণ ধর্মাচারী

মযহারুলের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে গবেষক ফকির আর বাউলতন্ত্রে চালু নারী দেহকে ঘিরে আলাদা আর এক অচেনা জগতের হদিস পান। সেখানে মার্গীয় ধর্ম আর সংস্কৃতি নারীদেহের অশুদ্ধতা সম্পর্কে বার বার বিধান দেয়, তার থেকে দূরে থাকতে বলে, তার বিরুদ্ধে ফকির আর বাউলতন্ত্র গড়ে তোলে ধর্মের নিম্নবর্গীয় এক প্রতিবিন্যাস। এখানে ধর্মাচারণে নারী শরীরের অপরিহার্যতা স্বীকার করেই চালু হয় 'চারি চাঁদের' সাধন। অথচ সেই প্রতিবাদী ধর্মের শরিক হয়েও মযহারুলের বিশ্বাস, 'মূলে তাদের দেহের কামনা থাকে না। তারা কামনা করে শূন্য।'[৯] পুরুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী মেয়েরা নিজেদের গড়ে-পিটে নিলে আর চিন্তা থাকে না, পতিব্রতা নারীর অপরিসীম সহনীয়তাই হয়ে দাঁড়ায় তার ভূষণ। কিন্তু এত আয়োজন থাকতেও কিছু কিছু অযাচিত ঘটনা পরিবার আর সমাজজীবনে নিয়ে আসে বিশৃংখলা, গোপিনী কুব্জা আত্মবোধে উদ্দীপিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীলারঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে উদ্যত হলে তাকে শাস্তি পেতে হয়।[১০] কারণ এই ব্যাপারে একমাত্র কৃষ্ণেরই একচেটিয়া অধিকার।

ভারতীয় সমাজে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে রাখার একাধিক বন্দোবস্ত ; পঞ্চায়েত, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। সমাজ সব সময় তাদের ওপর নজর রাখে। পুরুষ শাসিত সমাজের নিয়মকানুনের চাপে মেয়েরা বাধ্য হয় 'আদর্শনারী' হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে, পুরুষের ধারণা হয়ে যায় তার নিজের ধারণা। সত্য, পরিমার্জিত ভদ্র সমাজের ন্যায়-নীতি আত্মস্থ করে 'নারীত্বের' সীমালঙ্ঘনকারী 'খারাপ মেয়েদের' সম্পর্কে বিষোদ্গার করেন বামপন্থী নেত্রী।[১১] ছন্নছাড়া, অশালীন এই সমস্ত মেয়েদের স্থান সমাজের বাইরে, বে-আইনি ঝুপড়ি আর নিষিদ্ধ পল্লীতে। আর জেলখানায় তাদের আসা-যাওয়া তো প্রতিনিয়ত। ভদ্রসমাজে তাদের প্রবেশ নিষেধ। ফুলিয়া স্কুলে ভর্তি হতে গেলে 'হেডমাষ্টার ওকে চিনে নিলেন। তিনি ওর মায়ের 'গ্রাহক'। ভর্তি হওয়া হল না। ইস্কুলে ভাল বাচ্চারা পড়ে যে।' (পৃ. ১৩২)।

'হনুমানের' পাতায় পাতায় আসা অন্য মেয়েদের কথা ভদ্রসমাজের যাবতীয় নিশ্চিন্ততাকে ওলটপালট করে দেয়। নাগরিক সমাজে প্রচলিত বিধিব্যবস্থা আর ধারণায় আসে সন্দেহ। জেলখানা আর তার বাইরের এই 'অন্যেরা' আর কতক্ষণ ক্ষমতার দাপট নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে নিজস্ব কায়দায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে তার বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্র, ভদ্র-সমাজ আর তার যাবতীয় শৃংখলা বজায় রাখার বন্দোবস্ত নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। □

গ্রন্থসূত্র :

'হনুমান' থেকে উদ্ধৃত লাইনের সঙ্গে পাতার নম্বর দেওয়া হয়েছে। 'হনুমানের' প্রকাশক : অন্তধারা, কলকাতা। প্রকাশিত হয়েছে নভেম্বর ১৯৮৯।

১. দীপঙ্কর গুপ্ত, 'ইল্লেজিটিমেট' পলিটিকস অফ দি ইণ্ডিয়ান স্টেট, ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি, জানুয়ারী ২৩, ১৯৮৮, বোম্বাই, পৃ. পৃ. ১৪০-১৪২ ।

২. মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য, কলকাতা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৮ ।

৩. মিশেল ফুকো, ডিসিপ্লিন অ্যাণ্ড পানিশ : 'দি বার্থ অফ দি প্রিজন', ভিন্টেজ বুকস, ১৯৭৯, পৃ. ২৮০ ।

৪. ওয়ালট্রড আর্নস্ট, দি ইউরোপীয়ান ইনসেন ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া…, ইম্পিরিয়াল মেডিসিন অ্যাণ্ড ইণ্ডিজেনাস সোসাইটি, ডেভিড আর্নল্ড (সম্পাদিত) দিল্লী ১৯৮৯, পৃ. পৃ. ২৭-৪৪ ।

৫. মিশেল ফুকো, ম্যাডনেস অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন, ভিন্টেজ বুকস, ১৯৭৩, পৃ. পৃ. ৫৮-৬৪ ।

৬. অশোক মিত্র, প্রতিদিনের কথা, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ. পৃ. ৩৩-৩৬ ।

৭. ছায়া বেরা, উইমেন অ্যাণ্ড দি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৯০ পৃ. পৃ. ২৪-২৫ ।

৮. মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য, কলকাতা, পৃ. ৬৩৭ ।

৯. সুধীর চক্রবর্তী, আপন ঘরে পরের আমি, গভীর নির্জন পথে, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. পৃ. ১৫৮-২০১ ।

১০. রণজিত গুহ, ডমিন্যান্স উইদাউট হেজিমনি অ্যাণ্ড ইটস হিস্টরিওগ্রাফি, 'সাব অলটার্ন স্টাডিস ৬ষ্ঠ খণ্ড, রণজিত গুহ (সম্পাদিত) দিল্লী ১৯৭২, পৃ. পৃ. ২১০-৩০৯ ।

১১. শ্যামলী গুপ্ত, বিরাট অ্যাণ্ড দি বুর্জোয়া প্রেস, পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি, নিউ দিল্লী, জুলাই ২৯, ১৯৯০